লোক সাহিত্যের গল্প

জনশিক্ষা সিরিজ—৩৫

5.5
586

লোকসাহিত্যের গল্প

মধুসূদন মজুমদার

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

LOKSAHITYER GALPA
CODE NO. 9-69-063

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৭
৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

Acc No- 14935

দাম—
টা. ৪·০০

উৎসর্গ

সূচীপত্র

লীলা ও কঙ্ক	১
সোনাই	১১
রূপবতী	১৯
তিলক-বসন্ত	২৯
শিলাদেবী	৪২

লীলা ও কঙ্ক

গ্রামের নাম বিপ্রপুর। সেই গ্রামে বাস করেন এক ব্রাহ্মণ—নাম তাঁর গুণরাজ। গুণরাজের স্ত্রীর নাম ছিল বসুমতী।

গুণরাজ দরিদ্র ব্রাহ্মণ—সারাদিন ভিক্ষা করে যা কিছু পান, তাতেই স্বামী-স্ত্রী দুজনের দিন কাটে!

কালে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিল এক সন্তান—ষষ্ঠীপূজার দিন ব্রাহ্মণ তার নাম রাখলেন 'কঙ্ক'।

কঙ্কের বয়স যখন দুই বৎসর—তখন তার মা বসুমতী দেহরক্ষা করলেন। কঙ্কের কপালদোষে এর কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ গুণরাজও পরলোকগমন করেন। অনাথ বালক কঙ্কের দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। সবাই ভাবে, অপয়া কঙ্ককে ঘরে নিলে যদি আবার কোন অনিষ্ট ঘটে!

মুরারি নামে এক চণ্ডাল আর তার স্ত্রী যশোদা বিপ্রপুরেই বাস করত—তাদের কোন সন্তান ছিল না। বামুনের ছেলে কঙ্ক না খেয়ে মরবে—এই দেখে তারা কোলে তুলে নিলে দু-বছরের শিশু কঙ্ককে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান চণ্ডাল মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হতে লাগলো। কিন্তু

বিধি তার প্রতি বাম—তাই 'যেই ডালে ভর করে, ভাঙে সেই ডাল।' কঙ্কের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন একদিনের জ্বরে মুরারির মৃত্যু ঘটলো, আর মুরারির শোকে মরলো যশোদা।

কঙ্ক দ্বিতীয়বার বাপ-মা-হারা হলো। শ্মশানেই সে পড়ে রইলো কেউ আর তাকে ডেকে ঘরে নিল না।

ওই গ্রামেই থাকতেন গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, তেজস্বী এবং দয়ালু। পাঁচ বছরের কঙ্ককে শ্মশানে পড়ে থাকতে দেখে দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাকে তুলে আনলেন ঘরে। গর্গের স্ত্রী গায়ত্রী দেবী আপন সন্তানজ্ঞানে কঙ্ককে কোলে তুলে নিলেন।

গর্গের দুই বছরের কন্যা লীলার সাথী হলো কঙ্ক। দুইটি ভাইবোনের মতো বড়ো হতে লাগলো লীলা আর কঙ্ক।

বাল্যকাল থেকেই কঙ্ক ছিল অত্যন্ত মেধাবী। গর্গও উপযুক্ত শিষ্য পেয়ে কঙ্ককে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। অল্পদিনেই কঙ্ক নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলো এবং তার মধ্যে কবিত্বশক্তিরও বিকাশ দেখা গেলো। কঙ্ক ফরমায়েশী গানও লিখতে লাগলো।

লীলার বয়স যখন আট তখন গায়ত্রী দেবীর মৃত্যু হলো। কঙ্ক দু-দুবার মা-হারা হয়েও মা পেয়েছিল—লীলার সঙ্গে সঙ্গে যেন তারও মাতৃবিয়োগ হলো। এর পর থেকে কঙ্কই হলো লীলার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বাড়িতে সুরভি নামে একটি গরু আর পাটলি নামে তার একটি বাছুর ছিল। কঙ্ক আর লীলার কাজ হলো এদের সেবা করা। কঙ্ক গরু-বাছুর সঙ্গে নিয়ে যেতো মাঠে, আর লীলা তার জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতো।

দিনে দিনে মাস যায়, মাসে মাসে বছর ঘুরে আসে, কঙ্ক আর লীলার

বয়সও বাড়ে। বালিকা লীলা তরুণী হলো—তার দেহে রূপ যেন উছলে পড়ে।

পাঁচজন শিষ্য নিয়ে এক মুসলমান পীর এসেছিলেন সেই গ্রামে। পীরের অনেক গুণ। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। তিনি ধূলিমুঠোকে সোনা বানিয়ে দেন, বিনা ওষুধে লোকের রোগ সারান। কত লোকে তাঁর কাছে শিন্নি দেয়,—কিন্তু তিনি নিজে কিছু খান না, গরিবদের সব বিলিয়ে দেন।

একদিন এই পীর শুনলেন কঙ্কের বাঁশি—কী মধুর তার সুর! শুনে মুগ্ধ হলেন পীরসাহেব—কাছে ডেকে নিলেন তিনি কঙ্ককে।

ক্রমে কঙ্কও তাঁর বন্ধু হয়ে উঠলো! পীর মুসলমান বলে তাঁর প্রতি কঙ্কের শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছু কম ছিল না। সে পীরের উচ্ছিষ্ট ভোজনেও আপত্তি করতো না। এমন কি পীরের মুখে শুনে সে কলমাও শিখে নিয়েছিল। তারপর একদিন পীরের আদর্শে কঙ্ক লিখলো সত্যপীরের পাঁচালী। এর আগেই কঙ্ক "মলয়ার বারমাসী" লিখে কবিখ্যাতি অর্জন করেছিল।

পীরের নিকট কঙ্কের এই যাতায়াতের খবর কিন্তু গর্গের জানা ছিল না। কঙ্কের উপযুক্ত বয়স হয়েছে, অধিকন্তু সে নানা গুণের অধিকারী। এই কারণে গর্গ মনস্থ করলেন যে সমাজপতিদের বলে তিনি কঙ্ককে জাতে তুলবেন!

তিনি সভা ডেকে সবাইকে জানালেন যে অজ্ঞানে চণ্ডালের অন্ন খেলেও কঙ্ক ব্রাহ্মণ-সন্তান। অতএব তাকে জাতে তুলে দেওয়াই সংগত।

গ্রামের দলপতিদের মধ্যে একজন ছিলেন নন্দ পণ্ডিত। যুক্তিতর্কের বিচারে গর্গের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলেও তিনি গোঁ ধরে বসলেন যে কঙ্ককে কিছুতেই সমাজে গ্রহণ করা চলে না। এই বিষয়ে তিনি সমাজের পক্ষ থেকে গর্গকে জানালেন যে তিনি যদি কঙ্ককে নিয়ে থাকেন তাহলে তাঁকেও সমাজে পতিত হতে হবে।

গ্রামের লোকেরা একজোট হয়ে ঘোঁট পাকাতে লাগলো। তারা বললো যে, কঙ্ক যে শুধু চণ্ডালের অন্নই গ্রহণ করেছে তা নয়, সে মুসলমান পীরের কাছে দীক্ষা নিয়ে কলমা পড়ে মুসলমানও হয়েছে। অতএব তাকে নিয়ে কোনক্রমেই সমাজে থাকা চলে না।

দুষ্ট লোকেরা লীলার সঙ্গে কঙ্কের নাম জড়িয়ে আরও কত কিছু রটাতে লাগলো।—অবশেষে গর্গেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

কথায় বলে—'দশচক্রে ভগবান ভূত'—গর্গের অবস্থাও হলো তাই। নানা জনের মুখে নানা রকম মিথ্যা রটনা শুনে তাঁর মনে হলো যে লীলা এবং কঙ্ক উভয়েই বুঝি অপরাধী।

এমনিতে গর্গমুনি অতি শান্ত স্থির-ধীর পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর যখন মতিভ্রম হলো তখন তিনি অতি সাংঘাতিক হয়ে উঠলেন। তাঁর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও লোপ পেলো।

তিনি ভাবলেন যে এখন আর কঙ্ককে তাড়িয়ে দিলেও তিনি কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। তাই স্থির করলেন: প্রথমে তিনি কঙ্ককে হত্যা করবেন, তারপর প্রাণের পুত্তলী লীলাকেও হত্যা করে তিনি নিজে আত্মহত্যা করবেন।

কন্যার প্রতি, এমন কি নিজের প্রতিও আর তাঁর কোন স্নেহ রইলো না।

লীলার সঙ্গে কথা বলতে আগে তাঁর মুখ থেকে যেন মধু ঝরতো, এখন যেন বিষ ঝরতে লাগলো।

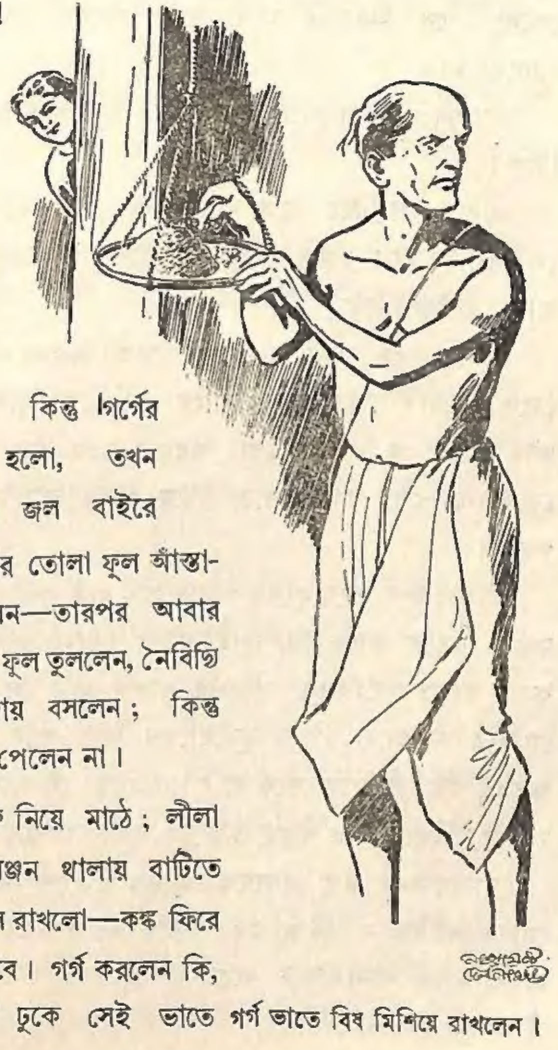

আগে পূজার মন্দিরের সব কাজ করতো লীলা। ঠাকুরের জন্যে জল আনা, ফুল তোলা, নৈবিদ্যি করা—এ সব ছিল লীলার দৈনন্দিন কাজ। কিন্তু গর্গের যখন মতিভ্রম হলো, তখন তিনি লীলার আনা জল বাইরে ফেলে দিলেন, লীলার তোলা ফুল আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেললেন—তারপর আবার নিজে জল আনলেন, ফুল তুললেন, নৈবিদ্যি করলেন—তবে পুজোয় বসলেন; কিন্তু মনের আনন্দ ফিরে পেলেন না।

কঙ্ক গিয়েছে গরু নিয়ে মাঠে; লীলা তার জন্যে ভাত-ব্যঞ্জন থালায় বাটিতে সাজিয়ে শিকেয় তুলে রাখলো—কঙ্ক ফিরে এলে তাকে বেড়ে দেবে। গর্গ করলেন কি, চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকে সেই ভাতে গর্গ ভাতে বিষ মিশিয়ে রাখলেন।

বিষ মিশিয়ে রাখলেন। কিন্তু দূর থেকে তা লীলা সবই দেখতে পেলো। সে অসাড়ের মতো বসে রইলো, কোন কথাও বলতে পারলো না।

তারপর গর্গ চলে গেলে এক সময় বিষাক্ত ভাতগুলো বাইরে ফেলে দিলে।

এদিকে কঙ্ক ফিরে এলো মাঠ থেকে। সে দেখে লীলার মুখে হাসি নেই, সে মুখ যেন মড়ার মতো ফ্যাকাশে। অবাক্ হয়ে ব্যাপার কি জানতে চাইলো কঙ্ক!

লীলা কিছুই বললে না—শুধু কঙ্ককে এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললো। অনেক সাধাসাধির পর লীলা জানালো সব কাহিনী। তার পিতা যে কঙ্ককে হত্যা করবার জন্যে তার ভাতে বিষ মিশেয়ে রেখেছেন,—সে কথা বলতে গিয়ে লীলা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো।

লীলার কথা শুনে কঙ্কের মাথায় যেন বাজ পড়লো। স্বপ্নেও যা সে কল্পনা করতে পারে নি, তাই ঘটতে চললো দেখে সে কতক্ষণ পর্যন্ত কথাই বলতে পারে নি। তারপর ধাতস্থ হয়ে সে লীলাকে জানালো যে তার মহাজ্ঞানী পিতা কু-লোকের কথা শুনে মতিভ্রষ্ট হয়েছেন। অতএব কঙ্ক এই স্থান ছেড়ে যাবে। অবশ্য সে আবার ফিরে আসবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস গর্গও শীঘ্রই তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন।

যাবার সময় কঙ্ক লীলাকে অনেক উপদেশ দিয়ে বললো—গর্গের সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ঘরে দেবতা আছেন, গরু-বাছুর আছে, আরো আছে নানাপ্রকার পশু-পাখি—এদের কারোর সেবাযত্নে যেন লীলা অবহেলা না দেখায়।

কঙ্ক গেল নিজের ঘরে—হয়তো চিরদিনের মতোই তাকে ঘর ছাড়তে হবে, তাই শেষবারের মতো নিজের ঘরখানায় বসে সে ভাবতে লাগলো।

এমন সময় লীলা চিৎকার করে জানালো যে স্থরভিকে সাপে কেটেছে। কঙ্ক ছুটে গিয়ে দেখলো স্থরভির সর্বদেহ বিষে নীল হয়ে গেছে।

তারপর লীলাকে নানা প্রশ্ন করে কঙ্ক বুঝতে পারলো যে, স্থরভিকে সাপে কাটে নি, কঙ্কের যে বিষ-মাখানো ভাতগুলো বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই ভাত খেয়েই তার মৃত্যু ঘটেছে।

শোকে অনুতাপে কঙ্ক অস্থির হয়ে উঠলো। সে ভাতগুলো খায় নি বলেই স্থরভির মৃত্যু ঘটেছে—এই ভেবে কঙ্ক আরও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। সে আর স্থির থাকতে পারলো না, রাত দুপুরে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

এক নিম গাছের নীচে কঙ্ক ঘুমিয়ে পড়েছিল। এক সময়ে স্বপ্নে মনে হলো এক গৌরকান্তি যুবক তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্রভাতেই গৌরাঙ্গ বলে কঙ্ক ঘর ছাড়লো।

কঙ্কের অদর্শনে লীলা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলো। ঘরে আর তার মন টেকে না—তাই সেও একসময় বেরিয়ে পড়লো কঙ্কের খোঁজে। কত জায়গায় গেলো কত জনের কাছে খোঁজ করলো—কিন্তু লীলা কঙ্কের কোন সন্ধানই পেলো না।

গর্গ কিন্তু কঙ্কের ভাতে বিষ মিশিয়েই পাগলের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি ফিরে এলেন, দেখলেন সারা বাড়ির উপর দিয়ে যেন সাংঘাতিক একটা ঝড় বয়ে গেছে।

গর্গ দেখলেন ঃ মরে পড়ে আছে তাঁর বড় আদরের সুরভি ; দেখলেন দেবতার পুজো হয় নি, ভোগ হয় নি, ফুলও তোলা হয় নি।

মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গর্গ দেবতার কাছে হত্যা দিলেন। শিষ্যরা এসে ফিরে ফিরে যেতে লাগলো—গর্গ দরজা খোলেন না। অবশেষে গর্গ দেবতার প্রত্যাদেশ পেলেন। দেবতা জানালেন যে গর্গ নির্দোষ। কঙ্ক ও লীলার উপর অবিচার করেছেন বলেই তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

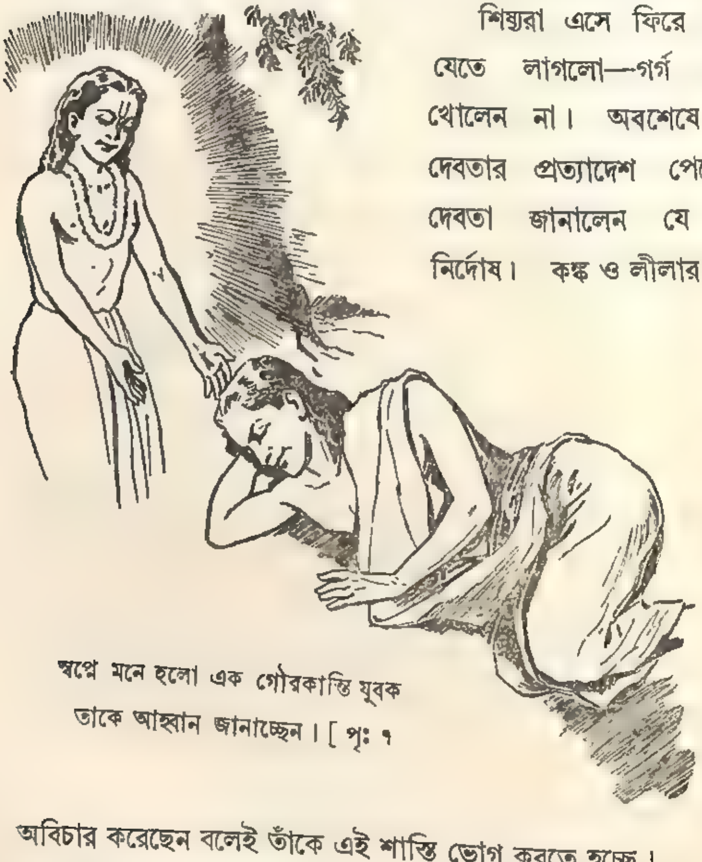

স্বপ্নে মনে হলো এক গৌরকান্তি যুবক তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। [পৃঃ ৭

গর্গ আবার হত্যা দিলেন। দু-দিনের পর দেবতা প্রত্যাদেশ করলেন। গর্গ শুনলেন ঃ কন্যার তোলা যে ফুল আর দূর্বা গর্গ ঝাঁট দিয়ে মন্দির

থেকে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই বাসী ফুলে দেবতার পুজো করলে তবেই তিনি গোহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

গর্গ সেই বাসী ফুলেই দেবতার পুজো করলেন। মনের ভ্রান্তি বুঝি দূর হলো। পরদিন সকালে তিনি তাঁর দুই শিষ্য বিচিত্র আর মাধবকে পাঠালেন কঙ্কের সন্ধানে। তিনি বলে দিলেনঃ কঙ্ক যেন তাঁকে ক্ষমা করে ফিরে আসে। যদি সে না আসে তবে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

বিচিত্র আর মাধব কঙ্কের সন্ধানে বের হলো।

কঙ্কের বিচ্ছেদে লীলা শয্যা নিয়েছে, তার আবাল্য সঙ্গী কঙ্কের কথা মনে করে সে পাগলের মতো হয়ে গেছে। তার মুখে আর হাসি নেই, রূপের আর জ্যোতি নেই।

ছমাস পর বিচিত্র আর মাধব ফিরে এসে জানালো যে কঙ্কের সন্ধান তারা পেলো না। এ খবর শুনে গর্গ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর আগ্রহে বিচিত্র আর মাধব আবার বেরুলো কঙ্কের সন্ধানে।

গর্গ তাদের বলে দিলেন যে কঙ্ক গেছে গৌরাঙ্গ-ভক্তদের কাছে। যেখানেই নাম সংকীর্তন হয় সেখানেই যেন তারা কঙ্কের খোঁজ করে।

দিনের পর দিন কেটে যেতে থাকে। এর মধ্যে একটা গুজব রটে গেলো যে কঙ্ক জলে ডুবে মারা গেছে। খবরটা লীলার কানেও এসে পৌঁছলো—লীলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করলো।

কিছুদিন পর মাধব ফিরে এলো,—কিন্তু কঙ্ক তার সঙ্গে নেই। সেও জানালো যে গৌরাঙ্গ-দর্শনাভিলাষী কঙ্ক জলে ডুবে মারা গেছে এই রকম একটা গুজব সেও শুনেছে।

লীলার জীবনের সাধ আহ্লাদ সব মুছে গেলো। সব শুনে জলটুকুও আর সে স্পর্শ করলে না। কোন্ সাধে আর সে বেঁচে থাকবে! অবশেষে নিদারুণ হতাশার মধ্যেই তার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হলো।

বিচিত্র কিন্তু অনেক খুঁজে কঙ্কের দেখা পেয়েছিলো। তারপর গর্গের কথা আর লীলার কথা বলে তাকে ফিরিয়েও এনেছিলো তার নিজের গ্রামে।

তবে তারা যখন এসে পৌঁছলো তখন গর্গ লীলার দেহ চিতায় চাপিয়ে দিয়েছেন।

———

সোনাই

গরিব বামুনের মেয়ে সোনাই। সোনাই আসলেও সোনা-ই যেন। যে দেখে সেই তু-দণ্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সোনা ছিল ছোট, ক্রমে সে বড় হতে লাগলো। যত সে বড় হয়, ততই তার রূপ যেন উপচে পড়ে।

এক তুই করে করে সোনার এগারো বছর বয়স হলো। গরিব বামুনের ঘর আলো হয়ে গেলো। এমন সময় মারা গেলেন সেই গরিব বামুন—সোনাইএর বাবা।

বিপদে পড়লেন সোনাইএর মা। একে ত অতি দরিদ্র তারা, তার উপর সোনাই বড় হয়েছে—তার রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাজেই এমন মেয়েকে নিয়ে একলা বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। এই ভেবে তার মা চললেন তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে।

দীঘলহাটি গ্রামে সোনাইএর মামার বাড়ি। তার মামার নাম ভাটুক ঠাকুর। ভাটুক ঠাকুর সচ্ছল অবস্থার লোক নন, তবু যজমানি করে তাঁর দিন চলে একরকম ভালোই। তাঁরা কেবল স্বামী-স্ত্রী তুজন, কোন সন্তানাদি নেই। কাজেই বোন আর ভাগনীকে পেয়ে তিনি খুশীই হলেন।

সোনাইএর মাও একটা আশ্রয় পেয়ে বাঁচলেন।

সোনাই বড় হয়েছে, তার বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। সোনাইএর মা আর মামা ছুজনে বসে সেই পরামর্শ ই করেন।

ঘটক ঠাকুর পাত্রের সন্ধান নিয়ে আসেন, কিন্তু কোন পাত্রই আর মনে ধরে না। ঘটক আবার বেরোন পাত্রের খোঁজে। এমন সোনার মেয়ে সোনাই তাকে তো আর যার তার হাতে তুলে দেওয়া যায় না!

একদিন সোনাই গেছে নদীতে জল আনতে—দৈবক্রমে সেখানে দেখা হলো এক শিকারীর সঙ্গে। হাতে তার পোষা ঘুঘু আর থলের মধ্যে খাগের শর।

একদিন ছু-দিন করে ক'দিনই দেখা হলো তাদের ছুজনে। তারপর একদিন শিকারী সাহসে ভর করে এক চিঠি লিখে সোনাইএর সই-এর হাতে দিল।

সোনাই সেই চিঠি পড়লো।

শিকারীর নাম মাধব। জমিদারের একমাত্র ছেলে। বিরাট তাদের বাড়ি, বাগান আর দীঘি। দীঘিতে আছে জলটুঙ্গী ঘর। শিকারী জানালো: সোনাই যদি রাজী হয়, তবে সে তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে।

সোনাই উত্তর দিল সেই চিঠির। সে জানালো: মা আর মামা তার কর্তা। সে নিজে তো কিছুই করতে পারে না।

চিঠি লিখে সোনাই চন্দন আর ফুলের মালা জড়িয়ে দিল তাতে, তারপর সেই চিঠি সখীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল মাধবের কাছে।

সেই দীঘলহাটি গ্রামে থাকত একজন লোক—বাঘরা তার নাম।

আকারে সে মানুষের মতো হলেও আসলে সে ছিল একটা পশু! এমন কোন দুষ্কর্ম ছিল না যা তার অসাধ্য।

সোনাই পড়লো একদিন সেই বাঘরার চোখে। সোনাইকে দেখেই তো তার চক্ষু স্থির! সে ভাবলো: এমন একটা রত্নের সন্ধান যদি সে দেওয়ানকে দিতে পারে তবে বহু টাকার ইনাম পাবে সে।

এই ভেবে বাঘরা গিয়ে দাঁড়ালো দেওয়ানের পাশে। তারপর জানালো তাকে সোনাইএর কথা। বললো: দেওয়ানের অন্দরমহলে অনেক রূপসী আছে, কিন্তু সোনাইএর মতো একটিও নয়।

বাঘরার মুখে এ কথা শুনে দেওয়ান ভাবনা তাকে এক কুলো সোনার মোহর পুরস্কার দিয়ে বললেন যে সোনাইকে তাঁর চাই-ই।

বাঘরা বুঝলো: কাজ উদ্ধার করতে পারলে আরো জুটবে। তাই সে গেলো সোনাইএর মামা ভাটুক ঠাকুরের কাছে। তারপর তাকে বিধিমতে ভজাতে লাগলো। সে বললে: দেওয়ানের হাতে তোমার ভাগনী পড়লে তারও দিন ফিরবে, তোমারও দিন ফিরবে। বাহান্ন পুরা জমি পাবে, শানবাঁধানো দীঘি পাবে—তারপর দেওয়ানের মনে ধরলে তোমার আর ভাবনা কি? সারা জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটিয়ে দেবে।

গরিব ব্রাহ্মণ এতখানি সৌভাগ্যের কথা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। তাই বাঘরার কথা শুনে তার নোলায় জল এসে গেলো। সে বাঘরার কাজে সম্মতি জানালো।

গোপন কথা শত চেষ্টাতেও গোপন রইল না। ক্রমে সোনাইও জানতে পারলো যে তার মামা তাকে দেওয়ানের হাতে তুলে দিতে

চাইছেন। সোনাই চোখেমুখে অন্ধকার দেখলো। তারপর অন্য কোন উপায় না পেয়ে চিঠি লিখলো মাধবকে। তাকে জানালো সব কথা।

মাধব সেই চিঠি পেয়েই খবর পাঠালো : সোনাই যেন সন্ধেবেলা নদীর ঘাটে উপস্থিত থাকে, মাধব নৌকা করে এসে তাকে নিয়ে যাবে।

দিন কেটে গিয়ে সন্ধ্যা এলো।

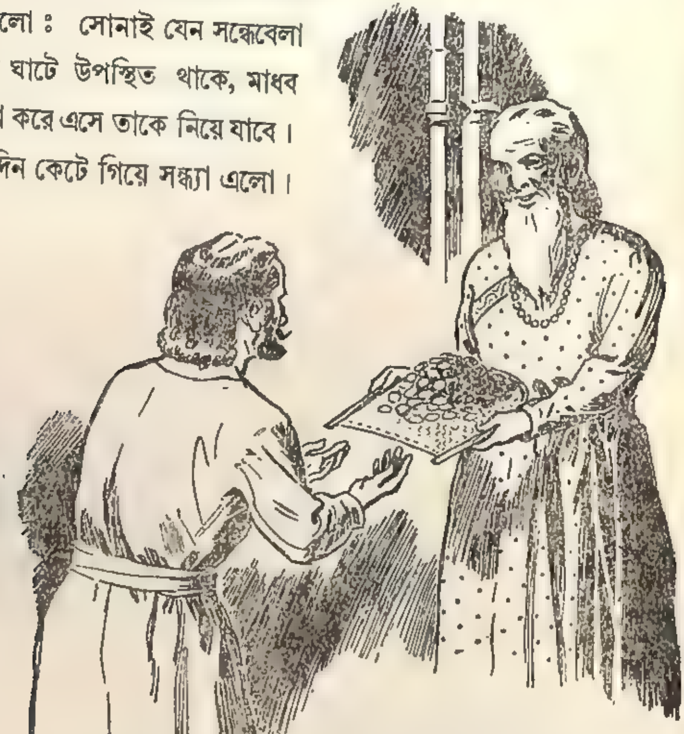

দেওয়ান বাঘরাকে এক কুলো মোহর দিয়ে বললেন যে সোনাইকে তাঁর চাই-ই…[পৃঃ ১৩

সোনাই খালি কলসী কাঁধে নিয়ে জল আনবার ছলে নদীর ঘাটে গেলো।

ঘাটে এসে দেখলো : কেয়াবনের পাশে একখানা ডিঙি বাঁধা। কিন্তু এদিকওদিক তাকিয়েও সে মাধবের দেখা পেলো না।

এ ডিঙি আসলে ছিল দেওয়ানের। দেওয়ানের লোকেরা সোনাইকে চুরি করে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ডিঙি নিয়ে এসেছিল। তারা যখন দেখলো, শিকার আপনি এসে জুটেছে, তখন তারা আর কালবিলম্ব করলো না। কয়েকজন গুণ্ডা এসে জোর করে তাকে ডিঙিতে তুলে নিয়ে ডিঙি নদীতে ভাসিয়ে দিল।

সোনাই চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু সোনাইএর কান্নায় গুণ্ডাদের মন ভিজলো না। সোনাইএর কান্নারও বিরাম রইল না।

মাধব নৌকা নিয়ে আসবে কথা ছিল—কিন্তু এলো না দেখে সোনাইএর মনে ভয় ঢুকলো : তার কোন ক্ষতি হয় নি তো! এক বিপদের উপর আবার এই দুর্ভাবনা—সোনাইএর কান্না শতগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

এদিকে ভীষণ ঝড় উঠেছে—ঝড়ে নৌকো উথালি-পাথালি করছে। একদিকে সোনাইএর চিৎকার, মাঝি-মাল্লাদের হইচই, তার উপর আবার ঝড়ের দাপট।

কিন্তু এই সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠলো একটি স্বর। মুহূর্তে সোনাই বুঝলো : এ স্বর মাধবের। দেওয়ানের ডিঙির কাছেই এসে পড়েছে মাধবের পানসি। মাধব শুনতে পেয়েছে সোনাইএর চিৎকার—তাই সে জানতে চাইলো, কে কাঁদে ?

মাধবের গলা চিনতে পেরেই সোনাই আরও জোর চিৎকার আরম্ভ করলো। মাধব অনুমান করলো : এই তো সোনাই !

এই ভেবেই মাধব দেওয়ানের ডিঙি আক্রমণ করলো। দেওয়ানের

লোকেরা মারামারির জন্যে তৈরী ছিল না। কাজেই মাধবের আক্রমণ তারা রোধ করতে পারলো না।

মাধবের ধারণা ছিল : সোনাইকে আনতে গিয়ে হয়তো দেওয়ানের লোকদের সঙ্গে মারামারি করতে হবে। এই ভেবে সে তৈরী হয়েই এসেছিল।

উভয় পক্ষের মারামারির ফলে জয়ী হলো মাধবের পক্ষ। তারা সোনাইকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো মাধবের বাড়িতে।

মাধবের বাড়িতে উৎসব শুরু হয়ে গেলো। মাধবের বাবা একজন নামকরা জমিদার। তিনি একমাত্র ছেলের বিয়েতে কোন কৃপণতা করেন নি। কাজেই বাদ্যভাণ্ড, আলোক-রোশনাই, খাওয়াদাওয়া কোন কিছুরই ত্রুটি হলো না। ক-দিন ধরে জমিদারবাড়িতে কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলল।

মাধবের সঙ্গে সোনাইএর বিয়ে হয়ে গেলো। এ বিয়েতে সবাই খুশী হলো। কারো মনে কোন খুঁত রইলো না।

ভগবান কিন্তু অতি সাধে বাদ সাধলেন। এই উৎসব সমারোহের মধ্যে হঠাৎ দেওয়ানের লোক এসে মাধবের বৃদ্ধ পিতাকে বেঁধে নিয়ে গেলো।

জমিদারবাড়িতে কান্নার রোল উঠলো। দেওয়ানের লোকেরা যখন এসেছিল, মাধব তখন তা কিছুই জানতো না। তাই যখন সে খবর শুনলো যে তার পিতাকে বেঁধে নিয়ে গেছে, তখন সে রেগে ফুলে উঠলো।

বিয়ের বেশ ছেড়ে দিয়ে মাধব দরবারের পোশাক পরলো। তারপর বিরাট এক ভাওয়ালিয়া নৌকা সাজাতে বললো। নববধূ সোনাইএর

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাধব তার পিতাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে রওনা হলো দেওয়ানের রাজধানীর দিকে।

কিছুদিন পর ফিরে এলেন––না মাধব নয়, ফিরে এলেন তার বৃদ্ধ পিতা। শোকে দুঃখে তাঁর চেহারা ভেঙে গেছে। কিন্তু যে খবর তিনি নিয়ে এসেছেন তাও তো তিনি ভাঙতে পারছেন না! কিন্তু সে খবর না জানিয়েই বা পথ কী?

বৃদ্ধ মুক্তি পেয়েছেন সত্যি, কিন্তু তিনি জামিন রেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্র মাধবকে। দেওয়ান বলেছেন, বৃদ্ধ যদি তাঁর পুত্রবধূ সোনাইকে দেওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন, তবেই পুত্র মাধব পাবে মুক্তি, নতুবা মাধবকে টুকরো টুকরো করে কেটে বধ্যভূমি রাঙিয়ে দেওয়া হবে।

এ সংবাদ জানাতে বৃদ্ধের বুক ভেঙে আসছিলো, তবু তিনি না জানিয়ে পারলেন না। মাধব তাঁর একমাত্র পুত্র, সেই পুত্রের প্রাণরক্ষা না হলে তাঁকে নির্বংশ হতে হবে, পিতৃপিতামহের পিণ্ডদানেরও আর কোন আশা নেই। তাই বাধ্য হয়েই বৃদ্ধ আবেদন জানালেন সোনাইএর কাছেঃ এক সোনাই-ই তাঁর পুত্রের প্রাণদান করতে পারে।

কান্নায় বুক ভেঙে আসতে চায় সোনাইএর, কিন্তু কাঁদলে চলবে না। দাঁতে দাঁত দিয়ে কান্না চেপে সোনাই জানালো শ্বশুরকেঃ সে মাধবকে উদ্ধার করে আনবে।

বৃদ্ধের দেহে প্রাণ ফিরে এল। সোনাইএর ইচ্ছামতো তিনি আবার ভাওয়ালিয়া সাজাতে আদেশ দিলেন।

দেওয়ান খবর পেলেন, সোনাইএর ভাওয়ালিয়া নদীর ঘাটে ভিড়েছে।

এ সংবাদ শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ছুটে গেলেন সোনাইএর নৌকায়।

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সোনাইএর সোনার প্রতিমা। তার রূপ দেখে দেওয়ানের ভিরমি যাবার অবস্থা। তবু যা হোক, সামলে গেলেন।

সোনাই বললো : তার আগমন-সংবাদ লুকিয়ে রাখতে হবে, কেউ যেন জানতে না পারে, কাক-পক্ষীতেও টের না পায়। আর মাধবকে এই মুহূর্তেই মুক্তি দিতে হবে। এবং সোনাইকে যেখানেই রাখা হোক, সন্ধের আগে দেওয়ান তার দেখা পাবেন না।

দেওয়ান সোনাইএর শর্তে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এলেন দরবারে।

বন্দীশালায় ছিল মাধব—তার হাতে পায়ে শিকল আর বুকে পাথর-চাপা। মাধবের শিকল খসানো হলো আর বুকের পাথরও নামানো হলো। তারপর যে ভাওয়ালিয়ায় সোনাই এসেছিল, সেই নৌকাতেই মাধব রওনা হলো দেশে।

দেওয়ানের দিন আর কাটতেই চায় না। অবশেষে দিনও একসময় শেষ হলো। সন্ধে হতেই দেওয়ান পাকা দাড়িতে কলপ মেখে আর ভুরভুরে আতরের গন্ধ ছুটিয়ে পায়ে পায়ে চললেন সোনাইএর ঘরের দিকে।

ধাক্কা দিতেই ঘরের দরজা খুলে গেল।

দেওয়ান কী দেখলেন?—দেখলেন সোনাইকে···না না, ঠিক সোনাইকে নয়, সোনাইএর মৃতদেহকে। হাতে তার বিষের কৌটো!

মাধবের নৌকা তখন অনেক দূর!

———

রূপবতী

সেকালের বাঙলাদেশের এক খুদে জমিদার, লোকে বলে রাজা—নাম তাঁর জয়চন্দ্র। জয়চন্দ্রের রাজ্য খুব বড় না হলেও তাঁর রাজপুরীর আকারখানা খুব ছোট ছিল না। তাছাড়া তাঁর ছিল টাকা-পয়সা, হাতি-ঘোড়া, লোক-লশকর—অর্থাৎ যা যা থাকলে রাজাকে মানায়, তার সব-কিছুই ছিল।

একদিন রাজা ভাবলেনঃ তিনি তো রাজা হয়েছেন, কিন্তু নবাব দরবারে এখনও সেলাম জানানো হয় নি। অতএব একবার যাওয়া দরকার।

এই ভেবে তিনি যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। তারপর দিনক্ষণ দেখে সঙ্গী-সাথী নিয়ে রাজা ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়ে বসলেন। সঙ্গে নিলেন আবের চিরুনি, রংবেরঙের পাখা, হাতির দাঁতের পাটি, গজমতির মালা—আরো অনেককিছু, সব নবাবকে নজরানা দেবেন বলে। আর নিলেন দশ হাজার টাকার এক তোড়া।

দীর্ঘদিনের পথ—আনন্দের খোরাক না থাকলে দিন চলা দায়। এই ভেবে রাজা সঙ্গে নিলেন গায়ক আর বাদকের দল আর তাদের নানারকম বাদ্যযন্ত্র।

জয়চন্দ্র রানীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, কন্যা রূপবতীকে

আশীর্বাদ করলেন, ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ নিলেন এবং সমবেত নগরবাসীদের আনন্দধ্বনির মধ্যে রাজধানীর পথে যাত্রা করলেন।

ফুলেশ্বরী নদী ছেড়ে নৌকা পড়লো নরসুন্দায়, তারপর নরসুন্দা ছেড়ে গেলো ঘোড়াউত্রায়। ক্রমে ঘোড়াউত্রাও শেষ হলো—এইবার নৌকা চললো মেঘনার উপর দিয়ে। এই ভাবে যেতে যেতে তিন মাস পরে নৌকা এসে পৌছলো মুর্শিদাবাদের ঘাটে।

তারপর যথাসময় জয়চন্দ্র নজরানার টাকা আর ভেট নিয়ে উপস্থিত হলেন নবাব দরবারে। নবাব খুশী হয়ে রাজা জয়চন্দ্রের উপযুক্ত সমাদর করলেন। নবাব-দরবারে খাতির পেয়ে জয়চন্দ্র বাড়ির কথা ভুলে গেলেন। এক দুই করে তিন বছর পার হয়ে গেলো—রাজা বাড়ি আসেন না। নবাবও তাঁকে ছাড়তে চান না।

তিন বছর ধরে রাজা বাড়ি আসেন না—রাজ্য অচল হয়ে পড়ে। আর তার চেয়েও বড় কথা—রাজার সেই যে ছোট্ট মেয়ে রূপবতী, সে এখন বেশ বড়টি হয়েছে—তার বিয়ের কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। মেয়ের বয়স চৌদ্দ পার হতে চলেছে—সেই ভাবনায় রানীর চোখে ঘুম নেই।

ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে রানী মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে রাজার কাছে চিঠি লিখলেন। বিশেষ করে লিখলেন কন্যা রূপবতীর কথা—রূপবতী সত্যি সত্যি রূপবতী হয়ে উঠেছে। তার বিয়ে এখন না দিলেই নয়। অতএব রাজা যেন কালবিলম্ব না করেই চলে আসেন।

এদিকে রানীর দরবারে জ্যোতিষীদের আনাগোনা শুরু হলো। তারা আসে রূপবতীর সৌভাগ্যের কথা বলে রানীকে সন্তুষ্ট করতে।

কেউ বা বলে রূপবতীর বিয়ে হবে উত্তর দেশে, কেউ বলে দক্ষিণ

দেশে। কেউ বলে রূপবতীর বিয়ে হবে রাজপুত্রের সঙ্গে, কেউ বলে

রানী লক্ষ্য করলেন, রাজার মুখে হাসি নেই।
সব সময়ই কী যেন ভাবছেন। [পৃঃ ২৬

তার বিয়ে হবে বণিকপুত্রের সঙ্গে। যিনিই আসেন, তিনিই বলেন, একমাত্র তাঁর গণনাই নাকি অভ্রান্ত!

Acc No - 14935

সর্বশেষ যে গণকটি এলেন, তিনি বললেন যে রূপবতীর 'গরদোষ' আছে। ব্রাহ্মণকে দান করলে আর ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলি মাথায় নিলে এই দোষ সারবে।

গণকদের দিয়ে রূপবতীর বিয়ের গণনা করিয়েই রানী কাল কাটাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে একদিন রাজা এসে উপস্থিত হলেন।

এতদিন পর রাজা নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন, কিন্তু মুখে তাঁর হাসি নেই। রানী লক্ষ্য করেন রাজা সব সময়ই কী যেন ভাবছেন। খেতে বসলে তাঁর মুখে দানা যায় না, ঘুমুতে গেলে তাঁর চোখের দুই পাতা এক হয় না।

রানী জানতে চাইলেন, রাজার কী হয়েছে। কিন্তু রাজার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। যে কথা তাঁর মনকে ভার করে রেখেছে, তা আর কিছুতেই তিনি উচ্চারণ করতে পারছেন না। অবশেষে রানীর পীড়াপীড়িতে রাজা জানালেন তাঁর মনের কথা ঃ

রানী রাজাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিই হয়েছে কাল। রাজা এই চিঠি দেখিয়ে নবাবের কাছ থেকে ছুটি চাইতে গিয়েছিলেন, আর নবাব সেই চিঠি পড়ে জানলেন যে রাজার এক রূপবতী কন্যা আছে। নবাবের সভাসদ্দের মধ্যে একজন নবাবকে জানালো যে রাজার কন্যা পরমাসুন্দরী।

এই সংবাদ শুনেই নবাব বায়না ধরলেন, রাজার এই মেয়েটি তাঁকে দিতে হবে। এর পরিবর্তে রাজা জায়গীর পাবেন, নবাব-দরবারে প্রচুর মর্যাদার আসন পাবেন।

রাজা নবাবের কথার জবাব দিতে পারলেন না। নবাব তাঁকে বললেন যে তিনি বিয়ের আয়োজন করছেন, রাজা যেন বাড়ি গিয়ে তাঁর কন্যাটিকে পাঠিয়ে দেন।

রাজা সার কথাটি বুঝে এসেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় নবাবের হাতে কন্যা সম্প্রদান না করলে নবাব জোর করেই তাঁর কন্যাকে নিয়ে যাবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর স্বেচ্ছায়ই হোক বা জোর করেই হোক, নবাব যদি রূপবতীকে নিয়ে যান, তবে রাজার জাত মান সবই যাবে। এ অবস্থায় বেঁচে থেকেও লাভ নেই।

তাই রাজা রানীকে জানালেন যে কন্যাকে নবাবের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে তার মরণ ভালো। কন্যাকে আগুনে পুড়িয়ে বা বিষ খাইয়ে হত্যা করে, তারপর নিজেও গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরবেন। এ ছাড়া আর উপায় নেই। কারণ, নবাব যে সময় দিয়েছেন, সেই সময়ও উত্তীর্ণপ্রায়—এর পরই নবাবী ফৌজ এসে যাবে ছোট্ট জয়পুর রাজ্যে।

বুকের দুধ খাইয়ে যিনি এতটুকু শিশুকে এত বড় করেছেন, তাকে নিজের হাতে মরণের কোলে তুলে দিতে পারেন কোন্ মা? রানীও পারলেন না।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত রানী এক উপায় ঠাওরালেন। রাজদরবারের এক কর্মচারী, নাম তার মদন। মদন বয়সে তরুণ, রূপে যেন কার্তিক, স্বভাবে-চরিত্রে নির্দোষ। রানী খবর দিলেন তাকে।

মদন এলো—বিনয়ে যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। রানী তাকে বললেন: রাত দুপুরে সে যেন এসে রানীর সঙ্গে একবার দেখা করে।

নিশুতি রাত—সবাই ঘুমিয়ে আছে—জেগে আছেন শুধু রানী আর মদন।

রানীর চোখের জলের পরশ পেয়ে জেগে উঠলো রাজকুমারী

রূপবতী। মায়ের চোখে জল দেখে সে অবাক্ হলো। সে জানতে চাইলো—কী ব্যাপার !

রানীর মুখ থেকে কথা সরলো না। তিনি তাকে টেনে আনলেন মদনের কাছে। তারপর মদনের হাতে তুলে দিলেন কন্যা রূপবতীকে। নিশুতি রাতে রাজকন্যা রূপবতীর সঙ্গে বিয়ে হলো অজানা অচেনা তরুণ মদনের।

কেউ জানলো না, কেউ শুনলো না—একটা শাঁখও বাজলো না, এক ঝাঁক উলুও পড়লো না—রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেলো। বরণডালা নেই, মঙ্গলঘট নেই, নেই কোন বাদ্যভাণ্ড।

আকাশ বোঝাই তারা আর জগৎব্যাপী বাতাস—এরাই রইলো এই বিয়ের সাক্ষী। যাকে গর্ভে ধারণ করেছেন রানী, তাকেও পুরীতে ঠাঁই দিতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল এসে গেলো। জল এলো কন্যা রূপবতীর চোখে, জল এলো মদনের চোখেও।

রাজবাড়ীর বিশ্বস্ত মাঝি কানা চৈতা। রানী রাত দুপুরে তাকে তলব করলেন। এলো কানা চৈতা। রানী বললেনঃ তোর নৌকায় যাবে দুজন লোক। এদের পরিচয় জিজ্ঞেস করবিনে, এদের দিকে তাকাবিনে। যেখানে গিয়ে প্রভাতী তারা দেখতে পাবি, সেখানেই ওদের নামিয়ে দিবি। খবরদার, এদের দিকে তাকাবিনে। আর এই রইলো তোর পুরস্কার।

নৌকায় পাল তুলে দিয়ে কানা চৈতা নৌকা ছাড়লো। শোঁশোঁ বেগে চললো নৌকা। তারপর যেখানে গিয়ে প্রভাতী তারা দেখা গেলো চৈতা সেখানেই নামিয়ে দিলো চড়নদারদের—এর বেশী এক বাঁক যাবারও হুকুম নেই তার।

চৈতার পানসি চলে যেতেই রূপবতী বুঝলো, বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ফুরুলো। সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

রানী বললেন, খবরদার ওদের দিকে তাকাবিনে, আর এই রইলো তোর পুরস্কার। [পৃঃ ২৪

মদন তাকে বললো যে ভাগ্যদোষে রূপবতী তার হাতে পড়লেও সে রাজকুমারীর মর্যাদা রক্ষা করবে। সে রাজকুমারীর দেহ স্পর্শ করবে না।

কিন্তু রাজকুমারী রূপবতী বললো যে তারা সাক্ষী রেখে তার মা

তাকে যার হাতে সমর্পণ করেছেন, তাকেই সে স্বামী বলে গ্রহণ করবে। মদনই তার স্বামী।

নদীর ধারে ঝোপের আড়ালে বসে তারা কথা বলছে, এমন সময় দুই জেলে এসে উপস্থিত।

কাঙ্গালিয়া আর জাঙ্গালিয়া—তারা দুই ভাই। মাছ ধরাই তাদের পেশা। কিন্তু ওইদিন সারা নদী চষে ফেলেও তারা একটা চুনোপুঁটি পর্যন্ত পেলো না। মন খারাপ করে তারা যখন নদীর ধারে নৌকা লাগালো, তখনই অবাক্ হয়ে দেখলো, দেব-দেবীর মতো বসে আছে একজোড়া মানুষ।

কাঙ্গালিয়া আর জাঙ্গালিয়া খুব আদরযত্ন করে মদন আর রূপবতীকে নিয়ে গেলো নিজেদের বাড়িতে।

দুই ভাইয়ের তিন বউ—বড় বউয়ের নাম পুনাই। তিনটি বউ হলে হবে কি, কারও কোন সন্তান নেই। তাদের সকলের মনেই তাই বড় দুঃখ।

পুনাই কিন্তু রূপবতীকে পেয়ে বড় খুশী। এই মেয়েটিকে সে নিজের সন্তানের মতোই পালন করবে।

মদন বহুদিন ধরে বাড়ি-ছাড়া। রাজবাড়িতে কাজ নেবার পর থেকে আর সে বাড়ি যায় নি। এখন যখন দেখলো যে রূপবতী একটা আশ্রয় পেয়েছে, তখন সে ভাবলো একবার বাড়ি ঘুরে আসবে।

রূপবতীকে বলে গেলো মদন—আটদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসবে বাড়ি থেকে।

রূপবতীর দিন কাটতে চায় না, তবু সে ধৈর্য ধরে কাটালো আটদিন। কিন্তু মদন এলো না। তখন রূপবতীর মনে চিন্তা জাগলো।

তারপর কেটে গেলো আরো ক'দিন—পুরে গেলো পুরো একমাস, কিন্তু তবু তো মদন এলো না! রূপবতীর মুখ কালো হয়ে গেলো—কী হলো, কে জানে!

রূপবতী কেঁদেকেটে গিয়ে পড়লো তার ধর্ম-মা
পুনাইয়ের কাছে। [পৃঃ ২৮

সবাই যখন মনের কথা ভাবছে, তখনই খবর পাওয়া গেলো মদনের।

রাজার পাইক তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখেছে রাজার কারাগারে। সে নাকি রাজকন্যাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে রাজকন্যার জন্যে।

খবর পেয়ে অবধি রূপবতীর খাওয়া নেই, ঘুম নেই। সে ভাবছে তার অদৃষ্টের কথা। বাসরে স্বামীকে এক খিলি পানও দিতে পারলো না—একদিন রেঁধে বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতেও পারলো না। এমনি করেই যে তার সাধ-আহ্লাদ সব শেষ হয়ে যাবে একথা কে জানতো? স্বামীর মুখ বুঝি আর সে এ জন্মে দেখতে পাবে না!

রূপবতী কেঁদেকেটে গিয়ে পড়লো পুনাইর কাছে। পুনাই তার ধর্মমাতা।

যে করেই হোক, তাকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতেই হবে—তারপর মরণ হয় তো দুজনের একসঙ্গেই হবে।

ওদিকে রাজার দরবার জমজমাট—রাজা বিচার করছেন। এমন সময় দুজন পুরুষ আর দুজন নারী জোর করেই ঢুকে পড়লো রাজসভায়।

জেলেনী পুনাই সোজা জিজ্ঞেস করলো রাজাকে—রাজামশাই, জামাইকে বন্দীশালায় আটকে রেখেছেন কেন?

রাজা তো অবাক্, অবাক্ সভাসদ্‌রাও—কে জামাই?

পুনাই পরিচয় দিলো: জামাই হলো মদন, আর কন্যা এই রূপবতী।

পেছন থেকে ধীরপদে এগিয়ে এলো রূপবতী—মাথার ঘোমটা তার খসে পড়লো। রাজা অবাক্ হয়ে দেখলেন: এই তো কন্যা রূপবতী!

রাজা মদনকে কারাগার থেকে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদে, সঙ্গে গেলো রূপবতী।

———

তিলক-বসন্ত

এক ছিলেন রাজা। রাজার নাম তিলক-বসন্ত আর তাঁর রানীর নাম সুলক্ষণা। তেঠেঙ্গা দেবতা কর্মপুরুষের কোপে পড়ে একদিন রাজার রাজত্ব গেল।

অথচ একদিন রাজার সবই ছিল, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া —কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু কর্মপুরুষ ঠাকুরের রোষে আজ তাঁর মন্দির হলো আঁধার—যেখানে আগে জ্বলতো সোনার গাছায় অসংখ্য দীপ!

রাজা রাজ্য ছাড়লেন, বনে পালালেন। কিন্তু রানী সুলক্ষণা রাজার সঙ্গ ছাড়বেন না, তিনিও বনে যাবেন। রাজা তাঁকে কত বুঝালেন কিন্তু রানী কোন কথাই শুনলেন না। তিনি সোনার খাট-পালঙ্ক চান না, বনের কুটিরে মাটির শয্যায় শুয়েই তিনি আনন্দ পাবেন, যদি রাজার সঙ্গে থাকতে পারেন। বনের পশুপাখিদের সঙ্গে তিনি মিতালি করে থাকবেন, তবু রাজধানীতে থাকবেন না।

অগত্যা রাজা আর রানীকে ফেলে যেতে পারলেন না—বনের পথে রানীও রাজার সঙ্গী হলেন।

যেতে যেতে তাঁরা গিয়ে পৌঁছুলেন এক বনে। সেই বনে বাস করে যাযাবর কাঠুরিয়ারা। তারা বনে বনে কাঠ কাটে—শাল-চন্দন-তাল-তমাল আরও কত কি! সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে যা পায় তাতেই তাদের দিন গুজরান হয়। বনের কাঠ ফুরিয়ে গেলে তারা আবার আর এক রাজার রাজ্যে চলে যায়। তা, কাঠ কাটলেও মনে তাদের দয়ামায়া আছে।

রাজা আর রানী গিয়ে উপস্থিত হলেন কাঠুরিয়াদের কাছে। মুখে ওদের হাসি, মনে কোন ছলচাতুরি নেই। ওরা বেরিয়েছিল ফল আর ময়ূরের পাখা কুড়োতে—এমন সময় রাজা-রানীর সঙ্গে তাদের দেখা হলো।

কাঠুরিয়ারা তো আর রাজা-রানী চেনে না, তারা দেখলো যেন এক দেবতা আর এক দেবী তাদের বনে এসে আবির্ভূত হয়েছেন। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রাজা আর রানীর পরিচয়।

তারা বললো: বনে থাকে বাঘ-ভাল্লুক, এখানে তাঁদের মত ভালো-মানুষ থাকতে পারবে কেন? কোন্ দেশকে আঁধার করে দিয়ে তাঁরা এলেন বনে? এমন দীঘল কালো কেশ, এমন পাটের শাড়ি পরনে যাঁর, তিনি কি রাজরানী না হয়ে পারেন! তবে তাঁদের এ দুর্দশা কেন?

রানী কাঁদলেন। কেঁদে বললেন আপনার পরিচয়। একসময় তাঁদের যে সবকিছুই ছিল, এখন কর্মপুরুষ ঠাকুর তাঁদের সব কেড়ে নিয়েছেন। তাই রাজরানী হয়েও তিনি আজ বনবাসিনী।

রাজা আর রানীর হাতে আজ আর একটা কানাকড়িও নেই। তিন-দিন ধরে তাঁরা উপবাসী। যে রাজার মাথার উপর থাকতো সোনার ছাতা, আজ সেই রাজা গাছের পাতায় মাথা ঢাকেন—ভাবতে ভাবতে তাঁর সোনার অঙ্গ কালো হয়ে গেছে।

কিন্তু রানী বলেন, দুঃখ পেতে পেতে এখন তাঁদের বোধ করবার শক্তিটুকুও লোপ পেয়েছে।

রাজা-রানীর দুঃখে হায় হায় করে উঠলো কাঠুরিয়ারা। এমন লোকেরও এমন দশা হয়!

যাহোক, তারা আর সময় নষ্ট করলো না! কেউ বা গেলো খাবার আনতে, কেউ বা গেলো জলের সন্ধানে। তারপর ফল এলো, চাক-ভাঙ্গা মধু এলো, এলো শালপাতার ঠোঙায় জল।

তিনদিন পর রাজা-রানীর পেটে তবু কিছু পড়লো। কাঠুরিয়াদের এই সরল আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে রাজা আর রানীর চোখেও এলো জল।

পরদিনই কাঠুরিয়ারা রাজা আর রানীর জন্যে ঘর বাঁধতে আরম্ভ করে দিল। শালকাঠের খুঁটি হলো, পাতার হলো ছাউনি। কিন্তু রাজবাড়ি বলে ঘর হলো পাঁচতলা। রাজা-রানীর জন্যে সাত কেরতা পাতা দিয়ে বিছানা তৈরি করা হলো।

অন্য সব কাঠুরিয়াদের সঙ্গে রাজাও বন থেকে ময়ূরের পাখা কুড়িয়ে আনেন, আবার কখন কখন তাদের সঙ্গে কাঠও কাটেন। বনের যে দিকটায় চন্দনকাঠ থাকে, রাজা ওইদিকেই যান—কম কাঠে বেশী পয়সা পাওয়া যায়।

রাজা যে সময়টা বনে থাকেন, ওই সময়টা কাঠুরিয়া বউরা এসে রানীর কাছে বসে নানা সুখদুঃখের কথা বলে।

এক দুই করে রাজার চল্লিশদিন কেটে গেল এই বনে। এই সময়ে চন্দন কাঠ বিক্রি করে রাজা এক কাহন কড়ি পেলেন।

রাজার মনে বড় আনন্দ। তিনি কাঠুরিয়াদের নেমন্তন্ন করলেন—

ভোজ দেবেন। রানী নিজেই সকলের জন্যে রাঁধতে লেগে গেলেন। শালপাতার ঠোঙায় ঠোঙায় ব্যঞ্জন রেঁধে রাখলেন, তারপর কাঠুরিয়া বউদের সঙ্গে কলসী নিয়ে চললেন নদীতে স্নান করবেন বলে।

রানী নদীতে গিয়ে দেখলেন, নদীর চড়ায় এক নৌকা আটকে রয়েছে।

এখন ব্যাপার হয়েছে কি, এক সাধু নৌকা বোঝাই মালপত্র নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলেন, এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের অভিশাপে সেই নৌকা চড়ায় ঠেকে যায়। তারপর সাধুর কাকুতি-মিনতিতে দৈববাণী হলো যে, কোন সতী নারীর স্পর্শ পেলে তবেই নৌকা চলবে!

সাধু তখন আশেপাশে সতী নারীর সন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় সদলে রানী গেলেন নদীর ঘাটে জল নিতে। রানীর দেহ থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। ওই দেখে সাধুর ধারণা হলো ঃ ইনি নিশ্চয়ই সতীসাধ্বী!

এই বিবেচনা করেই সাধু রানীর পায়ে পড়ে অনুরোধ জানালেন তার নৌকা ছোঁবার জন্যে।

রানীর হৃদয় ছিল খুব কোমল। কাজেই সাধুর কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হলো না। তিনি নৌকা ছুঁতেই নৌকা তরতর করে চলতে লাগলো।

নৌকা চালু হয়ে যেতে সকলেই অবাক্ হয়ে গেল। তখন নৌকার মাঝি-মাল্লারা ভাবলো ঃ আবার কখন কোন্ বিপদ দেখা দেয় তার ঠিক কি! এই সতী ঠাকরুনকে সঙ্গে নিতে পারলে আর কোন ভাবনাই থাকে না!—অতএব তারা সাধুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানীকে জোর করেই নৌকায় তুলে নিলো।

রানী চিৎকার করে কাঁদলেন—কিন্তু সেই কান্নায় পাষাণের হৃদয় গললো না। তখন সঙ্গিনীদের ডেকে রানী বললেন তাঁর দুঃখের কথা। নৌকা তরতর করে চলে গেলো।

সাধু রানীকে অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁর নৌকা ছোঁবার জন্যে। [দ্রঃ পৃঃ ৩২

এতগুলো অচেনা পুরুষের মধ্যে থাকতে হবে বিবেচনা করে রানী প্রার্থনা জানালেন কর্মপুরুষের কাছে ঃ তাঁর দেহে যেন গলিত কুষ্ঠ হয়, কেউ যাতে তাঁকে ছুঁতে না আসে।

দেবতার দয়ায় রানীর প্রার্থনা পূর্ণ হলো। তাঁর সমস্ত দেহে ঘা দেখা দিলো আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও এক চড়ায় ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়লো।

তা দেখে ভয় পেয়ে মাঝিমাল্লারা রানীকে এক বনের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

ওদিকে রাজা তিলক-বসন্ত অন্য সব কাঠুরিয়াদের নিয়ে বন থেকে ফিরেছেন। আজ যে তাঁর বাড়িতে সবাই ভোজ খাবে!

কিন্তু কোথায় কে? সারা বাড়ি যেন খাঁখাঁ করছে! ডেকে ডেকেও রানীর কোন সাড়া পেলেন না রাজা!

এমন সময় কাঠুরিয়া বউরা কাঁদতে কাঁদতে বললো সকল ঘটনা।

রাজা শোকে দুঃখে যেন পাগল হয়ে গেলেন। রানী সুলক্ষণাকে হারিয়ে তিনি বাঁচবেন কোন্ সুখে!

রাজার দুঃখে কাঠুরিয়ারাও বুক চাপড়ে কাঁদলো। তারপর তারা রাজাকে সান্ত্বনা দিলো। বললো যে রাত পোহালে তারা যেখান থেকেই হোক রানীকে খুঁজে বার করে আনবেই। রাজা যেন রাতটা শুধু ধৈর্য ধারণ করে থাকেন।

কিন্তু ধৈর্যধারণ করবার মতো মনের অবস্থা রাজার ছিল না। তিনি রাত দুপুরে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পাগল রাজা যেতে যেতে এক রাজার রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজার

রাজ্যে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে তিনি আশ্রয় নিলেন এক মালীর ঘরে। মালীর অসুখ হয়েছে, তাই রাজা তার হয়ে কাজ করেন আর খাবার পান।

সে দেশের রাজার সাত ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ে বড় হয়েছে—কিন্তু সেদিকে রাজার খেয়াল নেই। তিনি মেয়ের বিয়ের কোন ব্যবস্থাই করেন নি।

একদিন রানীর কথায় তাঁর চৈতন্য ফিরলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন: পরদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি যার মুখ দেখতে পাবেন সবার আগে তার হাতেই তিনি মেয়ে দেবেন। এর আর নড়চড় নেই।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজা বাগানে বেড়াতে বেরোন, ওই দিনও বেরুলেন: দেখলেন একটি তরুণ সুন্দর মালী বাগানে ফুল তুলছে।

রাজার কথার নড়চড় নেই—একবার মুখ দিয়ে যা বার করেছেন, তা করবেনই। ঘুম থেকে উঠে তিনি মালীর মুখ প্রথমে দেখেছেন, অতএব মালীর হাতেই তিনি কন্যা সমর্পণ করবেন।

কোন আয়োজন হলো না, উদ্যোগ হলো না—মালীর সঙ্গে সাতভায়ের বোন পবনকুমারীর বিয়ে হয়ে গেলো।

রাজার চোখে জল, রানীর চোখে জল।

বড় আদরের কন্যা পবনকুমারী—সে যাতে মালীর ঘরে কষ্ট না পায় তার জন্যে রাজা বাহির-ভাণ্ডারের সমস্ত ধান চাল পবনকুমারীকে দিয়ে দেবার জন্যে আদেশ করলেন।

মালী দুঃখ করে বলে: রাজকুমারী থাকতো শীতলপাটিতে, এখন খ্যাংরা পাটিতে তার কত কষ্ট হবে!

কিন্তু রাজকুমারী মনের মতো স্বামী পেয়েছে, কাজেই কোন কিছুতেই তার দুঃখ নেই। সে বলেঃ স্বামীর দুটো হাতই তার সোহাগের মালা, স্বামীর সোহাগের ডাক তার কানের ভূষণ। স্বামীর চরণই তার আশ্রয়।

মালীর মনেও আর কোন দুঃখ নেই। রাজকুমারীর মনটিও খুব বড়,—ভাণ্ডারের সব চাল সে গরিব দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। গরিবরা দু-হাতে তাদের আশীর্বাদ করে—মালীকে বলে মালীরাজা। তারা এখন আর কোন সাহায্যের জন্যে রাজবাড়িতে যায় না—মালীরাজার বাড়িই তাদের আশ্রয়।

রাজার সাত ছেলে—ব্যাপারটা তাদের চোখে ভালো লাগলো না। মালী হলো কিনা মালীরাজা—আর গরিবরা যায় তার বাড়ি! দেমাক ভাঙতে হবে।

রাজার সাত ছেলে হুকুম দিলোঃ ভাণ্ডারের এককণা শস্যও যেন মালীর বাড়ি না যায়। ভঁাড়ারে এক তালার উপর তিন তালা পড়লো।

রানী শুনে চোখের জল মোছেন, কিন্তু ছেলেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনিও কিছু করতে পারেন না। ঘরে খুদকণা যা কিছু থাকে, তাই তিনি পাঠিয়ে দেন মেয়ের বাড়িতে। আধপেটা খেয়ে মেয়ে-জামাইয়ের দিন যায়।

পবনকুমারীর হাত কিন্তু এতেও ছোট হলো না—দানের বহর তার একটুও কমলো না। ভঁাড়ারে ধানচাল নেই, তাতে ক্ষতি কি? গায়ে তো অলংকার আছে অনেক। ভিক্ষুকদের একটা একটা করে সমস্ত অলংকার বিলাতে লাগলেন পবনকুমারী।

সকলেই মালীরাজার জয়জয়কার করে।

একদিন মালীরাজার বাড়িতে ভিক্ষা করতে এলেন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ—আসলে ভিক্ষুক তো ব্রাহ্মণ নয়, কর্মপুরুষ ঠাকুরই ভিখারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছেন।

পবনকুমারী তো আর সে কথা জানেন না—ভিক্ষুক দেখে সাগ্রহে বললেন ঃ আপনি বসে বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী বাড়ি নেই—তিনি এসে আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

বড় দুঃখের সুরে ব্রাহ্মণ বললেন ঃ ভিক্ষা পাবার মতো কপাল্ কি আর আমার আছে? কত রাজ্যে কত দেশে গেলাম—কিন্তু কোথাও আমার ভিক্ষা জোটে না।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করেন রাজকুমারী ঃ এ কেমন কথা! কেউ কি আপনাকে ভিক্ষা দেয় না?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ব্রাহ্মণ ঃ না মা, কেউ আমাকে ভিক্ষা দেয় না—যেখানেই ভিক্ষা চাই, সেখান থেকেই আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। রাজবাড়িতে গিয়েছিলাম—তারা দেখিয়ে দিল মালীরাজার বাড়ি। এখন যদি তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়!

যথাসময়ে বাড়ি ফিরলেন তিলক-বসন্ত। বাড়িতে ভিক্ষুক বসে আছে শুনেই তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, কী ভিক্ষা চান তিনি।

ব্রাহ্মণ বললেন যে, কোন টাকাকড়ি ধনরত্নে তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি অন্ধ—চক্ষুরত্নই তিনি কামনা করেন। এখন মালীরাজা যদি তাঁর চোখ দুইটি তাঁকে দান করেন, তবেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

মালীরাজাকে খেটে খেতে হয়—কাজেই চোখ গেলে তাঁর রুজি-

রোজগার বন্ধ। কিন্তু তাহলেও ভিক্ষুককে কখনও ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই তিনি নিজ হাতে নিজের চোখ উপড়ে দিলেন ভিখারী ব্রাহ্মণ—কর্মপুরুষ ঠাকুরকে।

মালীরাজা নিজ হাতে নিজের চোখ উপড়ে দিলেন ভিখারী ব্রাহ্মণকে।

কর্মপুরুষ*ঠাকুর তো তিলক-বসন্তের চোখ দুটো নিয়ে চলে গেলেন —এখন তিলক-বসন্তের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠলো। পবন-কুমারীকেই রোজগার করে এখন স্বামীকে খাওয়াতে হয়।

সাত ভাই হাসে, সাত বউ ঠাট্টা করে। পবনকুমারী বাপের বাড়িতে মালীর কাজ করেন, ঘর দোর ঝাঁটপাট দেন। রানীর চোখে জল আসে। তাঁর ভাণ্ডার বোঝাই ধনরত্ন কিন্তু ছেলেদের ভয়ে তিনি কিছুই বলতে পারেন না—মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখেন।

একদিন রাজপুরীতে ঢোলডগর বেজে উঠলো—সাত রাজকুমার যাবেন শিকারে। হাতি-ঘোড়া, লোকলশকর কত তৈরী হলো—রাজকুমারদের সঙ্গে শিকারে যাবে।

তিলক-বসন্ত বায়না ধরলেন, তিনিও যাবেন শিকারে। অন্ধ তিনি —তিনি কী করে শিকার করবেন ? কিন্তু সে কথা তিনি মানছেন না। তিনি পবনকুমারীকে বললেন ঃ তিনি যেন তাঁর বাবার কাছ থেকে শব্দভেদী বাণ আর একটা ধনুক নিয়ে আসেন।

তাঁর আগ্রহ দেখে অগত্যা রাজকুমারী তাঁর বাবার কাছ থেকে শব্দভেদী বাণ আর ধনুক চেয়ে আনলেন। সাত রাজপুত্রের সঙ্গে অন্ধ মালীরাজাও শিকারে গেলেন।

সাতদিন ধরে সাত রাজপুত্র বনময় ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু একটা শিকারও জুটলো না। হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ালেন অন্ধ মালীরাজাও —তাঁরও কোন শিকার জুটলো না।

মালীরাজা একপা একপা করে চলতে থাকেন—হঠাৎ কী যেন তাঁর পায়ে ঠেকলো। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে

গেলো—তিলক-বসন্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছেন স্বয়ং রানী সুলক্ষণা।

তাঁর দেহে আর তখন কুষ্ঠের চিহ্নমাত্রও নেই। কর্মপুরুষের শাপ দূর হয়েছে—এই মুহূর্তেই বারো বছর পূর্ণ হয়েছে।

চোখ ফিরে পেয়ে রাজা সাতটা হরিণ শিকার করলেন।

ইতিমধ্যে সাত রাজপুত্র ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন যেখানে ছিলেন রাজা আর রানী।—শাপ দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার রূপও পালটে গেছে। বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে অপরিচিতা এক অপূর্বসুন্দরী নারীকে দেখে রাজপুত্রেরা আর ভগ্নীপতিকেও চিনতে পারলেন না।

তখন তিলক-বসন্ত হেসে তাঁর পরিচয় দিলেন।

সাত রাজপুত্র কিন্তু এতে খুশী হলেন না। তাঁদের মনে ভয় ঢুকলো। ভাবলেন ঃ মালীরাজা বোধহয় মায়া জানেন। হয়তো তিনি তাঁদের দূর করে দিয়ে নিজেই রাজ্য দখল করবেন। এই ভেবে তাঁরা মালীরাজাকে হত্যা করবার জন্যে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলেন।

অগত্যা রাজা তিলক-বসন্ত শব্দভেদী বাণের সাহায্যে তাঁদের পরাজিত ও বন্দী করলেন। তারপর নিজের হাতে শ্রীআংটি গরম করে সাত ভাইয়ের কপালে ছাপ দিয়ে দিলেন। তারপর হাতের আংটিটা খুলে দিলেন ওদের কাছে—পবনকুমারীকে যেন আংটিটা তারা দিয়ে দেয়।

রাজপুত্রেরা বাড়ি ফিরে এসে রটালো যে মালীরাজাকে বাঘে খেয়েছে। তারা বাঘের মুখ থেকে আংটিটা নিয়ে এসেছে তাদের বোনকে দেবার জন্যে।

রাজ্যের লোক মালীরাজার জন্যে শোক করলো। কিন্তু পবনকুমারী ভাইদের কাহিনী বিশ্বাস করলেন না।

পবনকুমারী শ্রীআংটিটা পেলেন, দেখলেন, এতে তিলক-বসন্তের পরিচয় লেখা আছে। এই পরিচয় পেয়ে তিনি তিলক-বসন্তের রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তিলক-বসন্ত রাজ্যে ফিরে এসে রাজা হয়ে বসেছেন। ওদিকে পবনকুমারীও সেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। এসেই সোজা রাজবাড়িতে না উঠে এক ধোপার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ধোপানী রাজা-রানীর কাপড় কাচে—সেই কাপড় এবার কাচলেন পবনকুমারী। তারপর সযত্নে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে শ্রীআংটিটা ভরে দিয়ে কাপড় পাঠিয়ে দিলেন রাজবাড়িতে।

রানী সুলক্ষণার হাতে পড়লো শ্রীআংটি, তিনি রাজাকে সেই আংটি দেখালেন। রাজা দেখেই বুঝলেন সব। তখনই তিনি ধোপার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন সোনার চৌদোলা।

পবনকুমারী চৌদোলা চেপে এলেন রাজবাড়িতে। রাজা তাঁকে সুলক্ষার হাতে সমর্পণ করে বললেন: এটি তোমার ছোট বোন।

ওদিকে পবনকুমারীর বাবার কানেও এখানকার সংবাদ পৌঁছালো। তিনি রাজ্য অর্ধেক করে একভাগ দিলেন তিলক-বসন্ত আর পবনকুমারীকে।

———

শিলাদেবী

এক ছিলেন রাজা—বামুনরাজা বলতো তাঁকে লোকে। বামুনরাজা একদিন দরবারে বসেছেন এমন সময় এক জংলী মুণ্ডা এসে উপস্থিত হল তাঁর কাছে। রাজাকে সেলাম জানিয়ে মুণ্ডা বললো ঃ রাজা, আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজার হৃদয় বড় কোমল—যে যা প্রার্থনা করে, যতখানি সম্ভব তিনি তা পূরণ করেন। তাই মুণ্ডাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে তুমি? কী তোমার প্রার্থনা, বল।

মুণ্ডা তার পরিচয় দিল। তার বাপ মা যে কে তা সে জানে না। তবে একজন লোক কয়েকটা কড়ি দিয়ে তাকে কিনে নিয়েছিল এবং তার উপর সারাজীবন যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। তারপর দশ বছর পর্যন্ত সে বনে বনে পালিয়ে বেড়িয়েছে—সময় মতো আহার জোটে নি, ঘুমনোর সুযোগ পায় নি। এক ভাবেই সে এতদিন কাটিয়েছে। এখন সে আশ্রয় চায়। তাই সকরুণ মিনতিতে সে বললো ঃ মহারাজ আপনার রাজত্বে এসেছি, দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিন।

রাজা তাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হলেন। বললেন : বেশ, তুমি থাকো এখানে, তোমাকে জায়গা-জমি দেবো। তুমি চাষবাস করতে পারবে।

কিন্তু মুণ্ডা জমিজমা চায় না, চাষবাস করা তার পোষাবে না। সে চায় বাড়ি পাহারা দেবার কাজ। সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো—পাষাণের মতো তার বুক, লোহার শাবলের মতো তার দুখানা বাহু।

রাজা অবাক্ হয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। তিনি আজ পর্যন্ত এমন বলিষ্ঠ লোক দেখেন নি। রাজা বললেন : আমার আঠারশো কোটালের উপর তোমাকে সর্দার নিযুক্ত করলাম। তুমি থাকবার জন্যে বাড়ি পাবে, আর রোজ চাল ডাল সিধা পাবে রাজবাড়ি থেকে।

মুণ্ডা বামুনরাজার সর্দার কোটাল নিযুক্ত হয়ে ভারী খুশী।

রাজার একমাত্র মেয়ে—শিলাদেবী। ভগবান্ যেন বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্য দিয়েই এই রূপের প্রতিমা গড়ে তুলেছিলেন।

বালিকা শিলাদেবী তরুণী হয়ে উঠলো। তার এই পরিবর্তন সে নিজে বুঝলো, সখীরা বুঝলো, বুঝলেন রাজা নিজেও। তাই তিনি শিলাদেবীর বিয়ের জন্যে ঘটক নিযুক্ত করলেন। ঘটকেরা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে ঘুরতে শুরু করলো।

দেখতে দেখতে পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘকাল মুণ্ডা বামুনরাজার বাড়ি পাহারা দিয়েছে, তার আঠারশো কোটালের উপর সর্দারী করেছে। এইবার সে ছুটি চায়। সে একদিন রাজার কাছে

আবেদন জানালো, সে ত্রিপুরা যাবে—এতদিন রাজার বাড়িতে কাজ কববার জন্যে তার যা পাওনা জমেছে তা চুকিয়ে দিয়ে রাজা তাকে বিদায় দিন।

বামুনরাজা তাঁর ভাণ্ডার খুলে দিয়ে বললেন,—মুণ্ডা তার ইচ্ছামতো ধন নিয়ে যেতে পারে। রাজা তাতে কোন আপত্তি করবেন না।

মুণ্ডা কিন্তু ধনরত্নের দিকে ফিরেও তাকালো না। সে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো : মহারাজ, আমি ধনরত্ন চাই না, আপনার কন্যা শিলাদেবীকে আমার হাতে সমর্পণ করুন,—এই আমার প্রার্থনা। এর জন্যেই আমি এতকাল আপনার সেবা করেছি।

মুণ্ডার আস্পর্ধা দেখে রাজা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি আদেশ দিতেই কোটালরা তাকে বেঁধে এনে ইচ্ছামতো প্রহার করলো। তারপর তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখলো।

কিন্তু মুণ্ডাকে রাজা বেশীদিন কারাগারে আটকে রাখতে পারলেন না, একদিন নিশা রাত্রিতে কারাগারের শিকল ভেঙে সে পালিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো।

এরপর এক দুই করে তিন বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে মুণ্ডা জঙ্গলের মধ্যে থেকে জংলীদের নিয়ে এক মস্ত দল পাকিয়েছে। তার গায়ের জ্বালা মেটে নি—সে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।

তারপর একদিন তার জংলীদল নিয়ে সে বামুনরাজার বাড়ি আক্রমণ করতে চললো। জংলীদের সে লোভ দেখিয়েছিল যে বামুন-রাজার বাড়ি লুঠ করতে পারলে তাদের জীবনে আর কোন অভাব থাকবে না।

তারা বোঁচকাবুঁচকির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে মজুরের বেশে এগুতে লাগলো। পথে যদি কেউ কাজের কথা বলে, তবে কেউ কাজ

রাজার আদেশে কোটালেরা মুণ্ডাকে বেঁধে এনে ইচ্ছামতো প্রহার করলো। [পৃঃ ৪৪

করতে রাজী হয় না—বলে, এদেশের লোক ঠগ, কাজ করিয়ে পয়সা দেয় না—তারা যাবে বামুনরাজার দেশে।

তারপর একদিন তারা গিয়ে বামুনরাজার দেশে পৌঁছলো এবং সুযোগ বুঝে এক গভীর রজনীতে তারা গিয়ে হানা দিলো বামুনরাজার বাড়িতে।

রাজবাড়ির প্রহরীরা তৈরী হবার আগেই জংলীদের বিষাক্ত তীরের আঘাতে ধরাশায়ী হলো। জংলীরা সোজা চলে গেলো ভাণ্ডারের দিকে, তারপর লুটে মন দিলো।

মুণ্ডার সেদিকে কোন দৃষ্টি ছিল না, সে সুযোগ বুঝে রাজবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

কিন্তু পাখি পালিয়েছে। রাজা আগেই তাঁর স্ত্রীকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে রাজপুরী ত্যাগ করেছিলেন।

যেতে যেতে বামুনরাজা পরগনাধিপতির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। জানালেন যে মুণ্ডার অত্যাচারে তিনি রাজ্য হারিয়েছেন আর সপরিবারে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন।

পরগনাধিপতি বামুনরাজার থাকবার জন্যে একটা মহাল ছেড়ে দিলেন আর তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে মুণ্ডার শাস্তিবিধান করে তিনি বামুনরাজাকে নিজের রাজ্য আবার পাইয়ে দেবেন। তাঁর কথার উপর ভরসা করে বামুনরাজা পরগনাধিপতির বাড়িতেই থাকতে লাগলেন।

শিলাদেবী রোজ সকালে বাগানে বেড়াতে যান। পরগনাধিপতির পুত্র রোজ দেখেন শিলাদেবীকে—শিলাদেবীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন।

তারপর একদিন সাহসে ভর করে রাজকুমার শিলাদেবীর কাছে বিয়ের প্রস্তার জানালেন।

শিলাদেবী রাজপুত্রের কথা প্রথমে উড়িয়েই দিলেন। বললেন যে তাঁদের বাড়ি নেই, ঘর নেই—এমন হাভাতের ঘরে পরগনাধিপতি কি আর ছেলের বিয়ে দেবেন?

রাজকুমার সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেও শিলাদেবী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন যে তাঁর বাবা তাঁর জন্যে রূপে গুণে আরও উপযুক্ত পাত্রী আনবেন।

রাজকুমার কিন্তু একেবারে নাচার—তিনি বললেন যে শিলাদেবীকে না পেলে রাজকুমার গৃহত্যাগ করে বনবাসী হবেন। তখন শিলাদেবী বললেন যে তাঁর বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে লোক মুণ্ডার হাত থেকে তাঁর রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে এবং মুণ্ডাকে শাস্তি দিতে পারবে, বামুনরাজা তার হাতেই দেবেন শিলাদেবীকে।

এই কথা শুনে রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি মুণ্ডার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করে তার হাত থেকে বামুনরাজার রাজ্য উদ্ধার করে আনবেন।

রাজকুমার দেশাধিপতির কাছ থেকে মুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললেন বামুনরাজার রাজ্যের দিকে।

শিলাদেবীর মনে দুঃখ হলো বড়। তিনি ভাবলেন: কেন মিছে রাজকুমারকে ঠেলে দিলাম বিপদের মুখে। মুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি তাঁর কোন অনিষ্ট হয়।

মুণ্ডা জংলীদের নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল বামুনরাজার রাজ্যে। এমন সময় সিপাই-সান্ত্রী নিয়ে রাজকুমার গিয়ে হানা দিলেন সেই রাজ্যে।

তুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। জংলীরা যুদ্ধে বড় কম যায় না। তবু তারা রাজকুমারের শিক্ষিত সেনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলো না—একে একে তারা জঙ্গলের দিকে পালাতে লাগলো।

মুণ্ডা অসীম বীরত্ব দেখিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লড়েছিল। কিন্তু রাজকুমারের তীরের আঘাতে অবশেষে তার অবস্থাও কাহিল হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত সেও এক গুপ্ত জংলী পথ দিয়ে পালিয়ে গেলো।

রাজকুমার জয়ী হয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। শিলাদেবী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

রাজকুমার মুণ্ডাকে ধরে আনতে পারেন নি বটে, তবে বামুনরাজার রাজ্য উদ্ধার করেছেন। তাই বামুনরাজা খুশী হয়েই তাঁর হাতে শিলাদেবীকে দান করতে চাইলেন।

পরগনার রাজার ছেলের বিয়ে—সারা পরগনা যেন বিয়েবাড়িতে ভেঙে পড়লো। কত আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত আর অনাহূত-রবাহুতের দল রাজবাড়িতে এসে ভিড় করলো। সারা বাড়িতে কেবল 'দায়তাং' আর 'ভুজ্যতাং' রব।

নানাদেশ থেকে কত বাজিকর আর বাদ্যকর এসেছে—তারা সবাই যার যার কেরামতি দেখিয়ে রাজাকে খুশী করবে আর নিজেরাও খুশী হয়ে ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই বিয়ের সাড়া-তাড়া পড়ে গেলো। সখীরা মিলে শিলাদেবীর কপালে দিল অলকাতিলক আর সিঁদুরের ফোঁটা। সযত্নে কবরী বেঁধে তাতে জড়িয়ে দিলো ফুলের মালা। কোন সখী মেহেদির রস দিয়ে তার পা রাঙালো ; কেউ বা তার হাতে পরিয়ে দিলো বাজু আর সোনার তাড়। তারপর চোখে কাজল, কানে কানফুল আর মেঘডম্বর শাড়ি পরিয়ে শিলাদেবীকে নিয়ে যাওয়া হলো বিয়ের আসরে।

ওদিকে রাজকুমারও বরবেশে বিয়ের আসরে এসে বসেছেন। বাদ্যকররা জোর বাজনা বাজাচ্ছে।

পশ্চিম দেশ থেকে যে বাদ্যকর দল এসেছিলো, তারা হঠাৎ বাদ্যযন্ত্র ফেলে দিয়ে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। আসলে এরা হচ্ছে মুণ্ডার সেই জংলী সঙ্গীরা—ছদ্মবেশে এসেছিল রাজার পুরীতে।

জংলীদের এই আকস্মিক আক্রমণের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। তারা এই আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো।

মুণ্ডার একটি তীর রাজকুমারের বুকে এসে লাগলো। রাজকুমার তখনি একটি ঘোড়ায় চড়ে মুণ্ডার অনুসরণ করতে চাইলেন—কিন্তু পারলেন না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। মুণ্ডার বিষাক্ত তীরের আঘাত তিনি সইতে পারলেন না—বিয়ের আসরেই প্রাণত্যাগ করলেন।

শিলাদেবী প্রথমে বিলাপ করলেন, পরে সহমরণে যাবার জন্যে তৈরী হলেন। বামুনরাজা তাঁকে ঠেকাতে গিয়েছিলেন. কিন্তু কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

রাজকন্যা রাজকুমারের সঙ্গে চিতায় গিয়ে উঠলেন।

একমাত্র মেয়ের এরকম শোচনীয় দুর্ভাগ্যে বামুনরাজা একেবারে ভেঙে পড়লেন। কী করবেন কিছুই ভেবে পান না। কিন্তু এভাবে

মুণ্ডার একটি তীর রাজকুমারের বুকে এসে লাগলো। [পৃঃ ৪৯

চুপ করে বসে থাকলে তো কিছু ফল হবে না! তাই এক ঘোড়ায়

চেপে ছুটে চললেন ত্রিপুরার রাজদরবারের দিকে। দরবারে গিয়ে পৌঁছুলেন বটে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না—ত্রিপুরারাজের সিংহাসনের পাশে গড়িয়ে পড়লেন।

বামুনরাজা কিছু বলতে পারলেন না সত্যি, তবে ত্রিপুরারাজের কানে আগেই সব খবর গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি বামুনরাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি সব খবর আগেই পেয়েছেন, তবে তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি মোচন করতে না পারলেও তাঁর উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

ত্রিপুরার রাজা তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি দলবলসহ মুণ্ডাকে ধরে এনে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সমাপ্ত

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

১। মহাভারতীয় গল্প
২। পুরাণের গল্প
৩। পল্লীগীতি কাব্য-কথা
৪। জাতকের গল্প
৫। উপনিষদের গল্প
৬। ভাগবতের গল্প
৭। ভারত নারী
৮। মঙ্গলকাব্যের কথা
৯। জ্ঞানে ও কর্ম্মে বাঙ্গালী
১০। সাহিত্যে বাঙ্গালী
১১। রামায়ণী কথা
১২। ধর্ম্মে বাঙ্গালী
১৩। দেশপ্রেমে ভারতবাসী
১৪। দেবী যুদ্ধের কাহিনী
১৫। ভক্ত-জীবন কাহিনী
১৬। মহাকবি বাল্মীকি
১৭। কালিদাস কাহিনী
১৮। বাইবেলের গল্প
১৯। কালিদাসের গল্প
২০। কুমার সম্ভব
২১। পৌরাণিক কাহিনী
২২। সেকালের রাজাদের গল্প
২৩। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প
২৪। বত্রিশ পুতুলের গল্প
২৫। কল্কিপুরাণের গল্প
২৬। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য
২৭। বিল্বমঙ্গল
২৮। কথাসরিৎ সাগরের গল্প
২৯। এঁদের ভুলো না
৩০। রূপ-সনাতন
৩১। অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর
৩২। সন্ত তুলসীদাস
৩৩। ভক্ত রুইদাস
৩৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গল্প
৩৫। সাধু তুকারাম
৩৬। তৈলঙ্গ স্বামী
৩৭। লোকসাহিত্যের গল্প
৩৮। সাধক জীবন-কাহিনী
৩৯। ঠাকুর হরিদাস
৪০। রঘুবংশ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড